জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ

ইউনিট ৪

ভূমিকা:

পৃথিবীতে অনেক রকম প্রাণীর বাস, একেই জীববৈচিত্র্য বলে। আর বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) হল উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবসহ পৃথিবীর গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জীন ও সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ওপর পরিবেশের বিরাট প্রভাব রয়েছে। তাই সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী সবস্থানে দেখা যায় না। যেমন– সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ দেখা যায় তা পাহাড়ি বনাঞ্চলে দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারও পার্বত্য বনাঞ্চলে দেখা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের আবাসের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। বিভিন্ন জীবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীব সম্প্রদায় এবং সে জীববৈচিত্র্যের নিয়ামক হলো পরিবেশ। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব; বনজ, মরুজ এবং জলজ পরিবেশ ও তাদের জীববৈচিত্র্য; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা; বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ; পরিবেশ দুষণ, পরিবেশ দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার, কৃষি পরিবেশের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, ক্ষয়িষ্ণু কৃষি পরিবেশেরে ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রভাব এবং কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষকের অবদান সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : জীব বৈচিত্র্য এবং বনজ, মরুজ ও জলজ পরিবেশ

পাঠ - ৪.২ : জীব বৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ

পাঠ - ৪.৩ : পরিবেশ দুষণ ও ক্ষয়িষ্ণু কৃষি পরিবেশ

পাঠ - ৪.৪ : কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষকের অবদান

পাঠ-৪.১ জীববৈচিত্র্য ও বনজ, মরুজ এবং জলজ পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে লিখতে পারবেন;
- বনজ, মরুজ এবং জলজ পরিবেশ ও তাদের জীববৈচিত্র্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

উর্বর পলি মাটির জমি এবং উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ। এদেশে উদ্ভিদের প্রজাতি সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি । বাংলাদেশের বনভূমি ও জলাভূমি মেরুদন্ডী প্রাণীতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় ১,৬০০ প্রজাতির মেরুদন্ডীর মধ্যে ৬৫৩ প্রজাতির মাছ, ৩২ প্রজাতির উভচর, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬২৮ প্রজাতির পাখি ও ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। একেক প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণী হতে আমরা একেক ধরনের উপকরণ পাই। এসব উপকরণ শুধু যে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাচ্ছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর আর্ন্তজাতিক গুরুত্বও রয়েছে। নিম্নে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

১) খাদ্য/পানীয়, জ্বালানী, ঔষধ, উন্নত শস্য জাতসমূহ, কারখানার কাঁচামালসমূহ সরবরাহ করে।

২) জীববৈচিত্র্যে মানুষের আগ্রহের কথা বিবেচনা করেই সরকার ন্যাশনাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা সৃষ্টি করেছেন। এতে একদিকে যেমন সরকারের অর্থ উপার্জন হচ্ছে অন্যদিকে কর্মব্যস্ত মানুষের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে।

৩) জীববৈচিত্র্যে শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্ব অপরিসীম।

৪) জীববৈচিত্র্যে পরিবেশগত গুরুত্বও রয়েছে যেমন- প্রকৃতির ভারসাম্য, জৈবিক উৎপাদনশীলতা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অবক্ষয়, পুষ্টির সাইক্লিং, মাটি ও পললসমূহের ডি-টক্সিফিকেশন, কার্বন সিকোয়েস্টেশন এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা রক্ষণাবেক্ষণ।

৫) বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একই বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করে। তাই প্রজাতির বৈচিত্র্য যত বাড়বে বা প্রজাতির সংখ্যা যত বাড়বে, সেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য তথা স্থিতিশীলতা তত বাড়বে। বাস্তুতন্ত্রের যেকোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ, সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খাদ্য শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটা। তাই বাস্তুতন্ত্রের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনবদ্য।

৬) প্রত্যেক জীবের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য প্রতিটি প্রজাতির জীবকে বাঁচিয়ে রাখা। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মানুষজনকে সচেতন করা।

বনজ, মরুজ এবং জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

বনজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

আমাদের দেশে চার ধরনের বন রয়েছে। যথা - পাহাড়ি বন, ম্যানগ্রোভ বন, সমতল ভূমির বন এবং গ্রামীন বন।

পাহাড়ি বন

পাহাড়ি বন পাহাড়ে বা পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত বনাঞ্চল। উষ্ণমন্ডলীয় চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ গাছপালা নিয়ে এ ধরনের বন গঠিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার বনের অন্যতম এই বন আছে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য অঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহে। এসব বন বাস্তুসংস্থানিকভাবে গুরুতপূর্ণ নানা

জাতের বৃক্ষ, বাঁশ ও লতা গুল্ম সমৃদ্ধ। এসব এলাকার মাটি লালচে এঁটেল ও চিকন বালি, আবার কোথাও উভয়ের মিশ্রণ। এসব এলাকার মাটি অম্লীয়। এসব এলাকার প্রধান গাছ গর্জন, গামার, তেলসুর, কড়ই, মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি। নিচু স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় জারুল, পিটালি, বরুন ও হিজল পাওয়া যায়। প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে হাতি, চিতাবাঘ, মেছোবাঘ, বনবিড়াল, ভাল্লুক, হরিণ, বিভিন্ন ধরনের বানর ও হনুমান, গুই, বিভিন্ন ধরনের সাপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে, বিশেষত: পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় বিভিন্ন আদিবাসীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বহুলাংশে বনের ওপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন ফসল ফলাতে তারা 'জুম' চাষপদ্ধতি অনুসরণ করে।

চিত্র ৪.১.১ : পাহাড়ি বন

ম্যানগ্রোভ বন

ম্যানগ্রোভ বলতে সাধারণভাবে জোয়ারভাটায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে বোঝায়। ম্যানগ্রোভ বন, জোয়ারভাটায় বিধৌত লবনাক্ত সমতলভূমি। উষ্ণমন্ডলীয় ও উপ-উষ্ণমন্ডলীয় অক্ষাংশের আন্তপ্লাবিত আবাসস্থলের সমন্বয়ে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম গঠিত। প্রাকৃতিকভাবে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় সুন্দরবন অর্থাৎ লোনা পানির বন দেখা যায়। সুন্দরবন বাংলাদেশ এবং ভারত দুইটি দেশে বিস্তৃত। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। এ আন্তপ্লাবিত জলাভূমি বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদানসমূহ যেমন- পানি প্রবাহ, পলি, পুষ্টি উপাদান, জৈব পদার্থ এবং জীবজন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এসব এলাকার মাটি এঁটেল বা দোআঁশ, কর্দমাক্ত, লোনা ও ক্ষারযুক্ত। সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। এছাড়াও রয়েছে গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বারেন প্রভৃতি বৃক্ষ। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়াও ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহীত হয়। এ বনে আছে বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা ডোরাকাটা বাঘ, মেছো বাঘ, বনবিড়াল, চিত্রা হরিণ, বন্য শুকর, অজগর, বিভিন্ন ধরনের সাপ, বন মোরগ, বিভিন্ন ধরনের পাখি, মৌমাছি, বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ প্রভৃতি। সুন্দরী বৃক্ষ বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে এবং গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন হতে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়।

চিত্র ৪.১.২ : ম্যানগ্রোভ বন

সমতলভূমির বন

সমতলভূমির বনের মধ্যে রয়েছে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও রংপুরের শালবন। এসব বনের মাটি প্রধানত লৌহপ্রধান, এঁটেল, লালচে ও অম্লযুক্ত। শালগাছ শালবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ-প্রজাতি হলেও এখানে বিভিন্ন প্রজাতির ছোটবড়, লতাগুল্ম ইত্যাদি গাছগাছড়া জন্মাতে দেখা যায়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পলাশ, সিধা জারুল, বহেড়া, হরীতকী, শীলকরই, শিমুল, কুসুম, পিতরাজ, আমলকি, কাঞ্চনলতা, কুমারলতা, শতমূলী, মৌআলু, ঝুম আলু, ভাঁট, আসামলতা, ছনঘাস, শালপানি, বনহলদি ইত্যাদি। এসব অঞ্চলে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, শিয়াল, বানর, হনুমান, সজারু, বিভিন্ন ধরনের সাপ, গুই, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়।

চিত্র ৪.১.৩ : সমতলভূমির বন

গ্রামীণ বন

গ্রামীণ বন বাংলাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। গ্রামীণ বনে সাধারণত আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কড়ই, শিমুল, তাল, খেজুর, নারকেল, সুপারি, গোলাপজাম, সফেদা, বাবলা, নিম, বাঁশ, ইত্যাদি গাছ দেখা যায়। এসব বনে শিয়াল, সজারু, বনবিড়াল, মেছোবাঘ, গুই, বিভিন্ন ধরনের সাপ, বহু প্রজাতির পাখি ও কীটপতঙ্গ দেখা যায়।

চিত্র ৪.১.৪ : গ্রামীণ বন

মরুজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের কেবল প্রতিবেশ ও পরিবেশ ব্যবস্থাই ধ্বংস করছে না বরং এ দেশের কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও নৌযোগাযোগের মতো অর্থনৈতিক খাতগুলির ওপরও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। তবুও এসব এলাকায় মরুজ পরিবেশ বিরাজ করছে না। কারণ, এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখনও বছরে প্রায় ১৫০০ মি. মি.। এখানকার মাটি অম্লীয়। এ মাটিতে বাবলা, খয়ের, আম, লিচু, রেইনট্রি ভালো জন্মে । রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, বগুড়া দিনাজপুর জেলা এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিভিন্ন ধরনের সাপ, গুইসাপ, শিয়াল, বুনো ইঁদুর, বেজি, বনবিড়াল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায়।

চিত্র ৪.১.৫ : মরুজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

চিত্র ৪.১.৬ : জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। কিছু কিছু স্থানে যেমন- পটুয়াখালী, বরিশাল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে নদীনালা এতো বেশি যে সে অঞ্চলে নদীজালিকার সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবন হলো ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার লবণাক্ত পানির বনভূমিতে গেওয়া, গরান, কেওড়া, পশুর, ধুন্দুল, বাইন এবং অন্যান্য ঠেসমূলবাহী উদ্ভিদ প্রধান। বনের মধ্যভাগে ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্যমূলক বৃক্ষ প্রজাতির প্রাধান্য বেশি। খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ অংশের অধিকাংশ এলাকা পরিমিত লবণাক্ত পানির বন, আর এখানকার মুখ্য উদ্ভিদ প্রজাতি সুন্দরী। এ লোনা জলের প্রধান প্রাণী হচ্ছে কুমীর, কামোট, ডলফিন, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির জলজ সাপ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। সিলেটের নিচু এলাকায় কিছু বন রয়েছে। সেখানে প্রধানত নলখাগড়া জাতীয় ঘাস, জারুল, হিজল, গামার, পিটালি ইত্যাদি জন্মে । টাঙ্গিয়ার এবং হাকালুকি হাওরে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে ভরপুর।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবসহ পৃথিবীর গোটা জীবসম্ভাবর, তাদের অন্তর্গত জীন ও সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রই হলো জীবন বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের বনভূমি ও জলাভূমি মেরুদন্ডী প্রাণীতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে প্রায় ১,৬০০ প্রজাতির মেরুদন্ডীর মধ্যে ৬৫৩ প্রজাতির মাছ, ৩২ প্রজাতির উভচর, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬২৮ প্রজাতির পাখি ও ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে চার ধরনের বন রয়েছে। যেমন- পাহাড়ীবন, ম্যানগ্রোভ বন, সমতল ভূমির বন ও গ্রামীণ বন। বনজ পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিধ ও প্রাণীতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে মরুজ পরিবেশ বিরাজ করছে না। বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম নদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। সুন্দরবন হলো ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরবনের জলজ পরিবেশ জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। বাংলাদেশে কম বেশী কত প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে?

ক) ৩০০০ খ) ৪০০০

গ) ৫০০০ ঘ) ৬০০০

২। গর্জন কোন্ ধরনের বনের বৃক্ষ?

ক) গ্রামীণ বন খ) পাহাড়ি বন

গ) ম্যানগ্রোভ বন ঘ) সমতলভূমির বন

৩। কোন্ জেলায় শালবন দেখতে পাওয়া যায় ?

ক) চট্রগ্রাম খ) বরিশাল

গ) গাজীপুর ঘ) খুলনা

৪। সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষের নাম কী ?

ক) গোলপাতা খ) ছন

গ) হিজল ঘ) সুন্দরী

পাঠ-৪.২ জীব বৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন।

জীববৈচিত্র্য এবং জীবের আবাসস্থলের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক আবাসস্থলে প্রাকৃতিক নিয়মে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জীব অবস্থান করে। কিন্তু মানব সমাজের প্রয়োজনে আমরা যখন কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বেশি পরিমাণে ভোগ করে ফেলি তখন সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে যায় তবে হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং এর ফলে হরিণের খাদ্য চাহিদা মিটাতে যেয়ে গাছের সংখ্যা কমে যাবে। ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হবে না। আবার বাঘের সংখ্যা বেড়ে গেলে হরিণের সংখ্যা কমে যেতে পারে। এর ফলে নির্দিষ্ট এলাকায় একই জাতের অসংখ্য গাছ গজানোর সম্ভাবনা থাকবে এবং এরা মাটির খণিজদ্রব্যের জন্য বেশি মাত্রায় প্রতিযোগিতা করবে। ফলে কোনো চারাগাছ সুস্থভাবে বেঁচে ওঠতে সক্ষম হবে না। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের স্বার্থে জীববৈচিত্র্যে রক্ষা করা আবশ্যক। শুধু কয়েকটি প্রজাতি রক্ষা করলেই জীববৈচিত্র্য রক্ষা হয় না। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সব প্রকারের জীব প্রজাতির ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেয়া। কিন্তু অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে অনেক গাছপালা ও লতাগুল্ম এবং প্রাণিবৈচিত্র্য আজ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেরও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য আমাদের দেশে রয়েছে। দেশের কৃষি অগ্রযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে ত্বরান্বিত করতে জীববৈচিত্র্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১) প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের খাদ্য, নির্মাণ সামগ্রী, ফাইবার, জ্বালানি কাঠ, শিল্পজাতীয় পণ্য, ঔষধ ইত্যাদি সরবরাহ করে। কাজেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

২) জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) পুনরুজ্জীবন (rejuvenation) এবং সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ অরণ্য সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারে। এছাড়াও হাজার হাজার পোকামাকড় এবং পাখি, এবং অসংখ্য জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বনাঞ্চলে রয়েছে।

৩) প্রাকৃতিক পরিবেশ তার আকৃতি, কাঠামো এবং রঙ দিয়ে মানুষের মনোরম আনন্দ দেয় যা মানুষের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। প্রাণী, উদ্যান পরিদর্শন, পাখি পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতি শিল্প এবং প্রকৃতি উপভোগ করার এবং প্রশংসা করার উপায় হিসাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মতো কার্যকলাপ কেবল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

৪) কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন ভারসাম্য যা জলবায়ূ পরির্বতনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করে। বায়ূমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের মধ্যে ভারসাম্য জীববৈচিত্র্যের মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যর্থতা গ্রিনহাউস প্রভাব এবং ওজোন ধীরে ধীরে হ্রাস করার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড জমে থাকে। ফলস্বরুপ বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অনস্বীকার্য।

৫) জীববৈচিত্র্য ইকোসিস্টেমগুলি অক্ষত রাখা মানবকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস সংক্রামক রোগগুলির বিস্তার বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ এবেলা ভাইরাস, ম্যালেরিয়া মহামারীটি জীববৈচিত্র্যের বন উজাড়ের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ/উপায়গুলি উল্লেখ করা হলো-

ইন সিটো (In-situ) সংরক্ষণ (Conservation):

১. সুরক্ষিত অঞ্চলসমূহ (Protected areas) - জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং গেম রিজার্ভ (Game reserves)।

২. বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট - সুন্দরবন ।
৩. রামসার (Ramsar) সাইট - সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর ।

এক্স সিটো (Ex-situ) সংরক্ষণ (Conservation):
১. বোটানিক্যাল গার্ডেন - মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, বলদা গার্ডেন ।
২. সংরক্ষণ প্লট (Preservation Plots) - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট বিভিন্ন পাহাড়ী বনে ৫টি এবং সুন্দরবনে ২৭টি সংরক্ষণ প্লট প্রতিষ্ঠা করেছে ।
৩. জিন/ক্লোন ব্যাংক (Gene/Clon banks) - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউটে ২টি জিন ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে । একটি হাইকো (Hyako), চট্রগ্রামে এবং অন্যটি উখিয়া, কক্সবাজারে অবস্থিত ।
৪. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট আরবোরেটমস (BFRI Arboretum's)- এই আরবোরেটমসে ২৭ প্রজাতির বাঁশ, ৪০ প্রজাতির ঔষধি গাছ এবং ৭ প্রজাতির আখ আছে ।

ইন সিটো এবং এক্স সিটো (Both in-situ and ex-situ) সংরক্ষণ (Conservation)-
১. ইকো-পার্ক - বাঁশখালি ইকো-পার্ক, মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক, কুয়াকাটা ইকো-পার্ক, সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, মধুটিরা ইকো-পার্ক।
২. সাফারী পার্ক – দুলাহাজরা সাফারী পার্ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক।

সারণী ৩ : বাংলাদেশের ইকো-পার্ক এবং সাফারী পার্ক (Both in-situ and ex-situ) তথ্য -

ক্রমিক নং	ইকো-পার্ক/সাফারী পার্ক	বনের প্রকার	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	বাঁশখালী ইকো-পার্ক	পাহাড়ী বন	চট্রগ্রাম	১২০০	২০০৩
২।	মাধব-কুন্ড ইকো-পার্ক	পাহাড়ী বন	মৌলভীবাজার	২৫৩	২০০০
৩।	কুয়াকাটা ইকো-পার্ক	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	পটুয়াখালী	৫৬৬১	২০০৬
৪।	সীতা-কুন্ড ইকো-পার্ক	পাহাড়ী বন	চট্রগ্রাম	৪০৩	২০০০
৫।	মধু-টিলা ইকো-পার্ক	শাল বন	শেরপুর	১০০০	১৯৯৯
৬।	দুলাহাজরা সাফারী পার্ক	পাহাড়ী বন	কক্সবাজার	৯০০	১৯৯৯
৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক	শাল বন	গাজীপুর	১৫৪২	২০১০

শিক্ষার্থীর কাজ বাংলাদেশে জীব বৈচিত্র্য সংলক্ষণের জন্য গৃহীত উদ্যেগ সমূহের একটি পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক অবস্থার কারনে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ গরুত্বপূর্ণ। জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং সুরক্ষায় গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংলক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। যেমন- ইনসিটো সংরক্ষণ-সুরক্ষিত অঞ্চলসমূহ, বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট, রামসার সাইট, এক্স মিটো সংরক্ষণ - বোটানিক্যাল গার্ডেন, সংরক্ষণ প্লট, জিন ব্যাংক, আরবোরেটমস ও ইনসিটো এবং এক্স সিটো সংরক্ষণ ইকো পার্ক, সাফারী পার্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। অরণ্য আমাদের কী দেয় ?
ক) পানি খ) সালফার ডাই-অক্সাইড
গ) অক্সিজেন ঘ) কার্বন-ডাই- অক্সাইড

২। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য কোন গ্যাস দায়ী ?
ক) অক্সিজেন খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড
গ) কার্বন মনোঅক্সাইড ঘ) সালফার ডাই অক্সাইড

৩। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের মূল উদ্দেশ্য কী ?
ক) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা খ) চিত্ত বিনোদন
গ) মৃত্তিকা উর্বরতা বৃদ্ধি ঘ) প্রাণীর প্রজনন

৪। মধু-টিলা ইকো-পার্ক কোন্ জেলায় অবস্থিত ?
ক) মৌলভীবাজার খ) পটুয়াখালী
গ) চট্রগ্রাম ঘ) শেরপুর

পাঠ-৪.৩ পরিবেশ দূষণ ও ক্ষয়িষ্ণু কৃষি পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পরিবেশ দূষণের উৎস/কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃষি পরিবেশের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্ষয়িষ্ণু কৃষি পরিবেশের ক্ষতিকর/বিরূপ প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। সহজভাবে বলতে গেলে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে উপাদান বিদ্যমান নেই তার উপস্থিতি অথবা কোনো উপাদানের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি যা মানুষ, উদ্ভিদ বা যে কোনো প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর তাকেই পরিবেশ দূষণ বলে। দূষণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় মানুষের নিজস্ব স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত করা যা প্রধানত বর্জ্য বা ক্ষতিকর পদার্থ দ্বারা বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা দূষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পরিবেশ দূষণের উৎস/কারণ

১) বিভিন্ন শিল্প কারখানা থেকে নির্গত অপরিশোধিত আবর্জনা নদী, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ে নিপতিত হয়ে পানির দূষণ ঘটায়। এসব আবর্জনায় সায়ানাইড, ফেনল, এ্যামোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বিদ্যমান থাকে।

২) কোনো কোনো শিল্প-কারখানা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, ইটের ভাটা ইত্যাদি স্থান থেকে বেরিয়ে আসা ধুলো ও বালিকণা বায়ুতে মিশ্রিত হয়ে দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের প্রধান উৎসই হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)। বায়ুমন্ডলে বর্ধিত CO_2 -এর মূল কারণ ব্যাপকহারে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন। কয়লা ও খনিজ তেল জাতীয় জ্বালানীসমূহের পূর্ণ বা অপূর্ণ দহনের ফলে অথবা শিল্প-কারখানা ও মোটরযান হতে নির্গত ধোঁয়া থেকে কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO) নির্গত হয়, ফলে বায়ুতে মিশ্রিত হয়ে দূষণ ঘটায়।

৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানুষের মৌলিক চাহিদা বৃদ্ধিতে শিল্প-বিপ্লব হচ্ছে। জনসংখ্যা ও শিল্প কারখানা উভয়েই বাড়িয়ে তুলছে বায়ু দষণের উপকরণ CO_2 যা গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিপর্যয় ডেকে আনবে। মানুষ উদ্ভাবন করেছে উফশী জাতের ফসল। ফলন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে সার ও কীটনাশক। ফলে বায়ু ও পানি কলুষিত হচ্ছে।

৪) এসিড বৃষ্টি, অম্লীয় রাসায়নিক সারের ব্যবহারে মৃত্তিকার অম্লতা বৃদ্ধি পেয়ে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে। অপরিকল্পিত কৃষি ভূমির ব্যবহার, নিবিড় উফশী ফসল চাষের ফলে দিন দিন মৃত্তিকা জৈব পদার্থের পরিমান কমে যায়। এভাবে মাটি ক্রমশঃ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অবাঞ্চিত শিল্প বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের মিশ্রণ মৃত্তিকা দূষণ ঘটায়।

৫) দারিদ্রতা পরিবেশের ক্ষতি করে। দারিদ্র্যের কারণে জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, জ্বালানি, আশ্রয়) মেটাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার করে। ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

পরিবেশ দূষণের প্রভাব

যেহেতু আমরা পরিবেশ দূষণের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করেছি, এটির নেতিবাচক প্রভাবগুলি উল্লেখ করা হলো

১. স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বায়ু দূষণীয় পদার্থ সে এলাকার মেঘ, বৃষ্টিপাত, তাপ প্রবাহ ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২. বায়ুমন্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন ধাতুসমূহের কণা মানবদেহে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। ভারী ধাতব কণা এজমা, কাশি, ফুসফুস এবং গলার অন্যান্য রোগের জন্য দায়ী।

৩. বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। ফলে জলবায়ুতে ঘটাবে ব্যাপক পরিবর্তন। মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। তলিয়ে যাবে পৃথিবীর বহু নিম্নাঞ্চল।

৪. বাতাসে খনিজ দ্রব্যের ধুলোবালি আধিক্য হলে উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়া-কর্মে ব্যাঘাত ঘটে।

৫. পানিতে জৈবিক দ্রব্যের জারণের ফলে প্রচুর অক্সিজেন (O_2) ব্যয়িত হয় এবং CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে পানিতে শৈবাল, অণুজীব ও ফাইটোপ্ল্যাংটনের আধিক্য ঘটে।

৬. কীটনাশক দ্রব্য খাদ্য-শিকলে প্রবেশ করে মানবদেহে রোগের জন্ম দেয়।

৭. পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের বর্জ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জন্যই তেজস্ক্রিয়তা জনিত বিপদ সৃষ্টি করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

৮. পরিবেশ দূষণ প্রায় একচেটিয়াভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নির্মিত যা বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৯. মাটি দূষণ মাটিতে বিদ্যমান অনুজীবের ধ্বংস ঘটায়, যা খাদ্য শৃঙ্খলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

পরিবেশ দূষণের প্রতিকার

পৃথিবীর আবির্ভাবের প্রারম্ভিক কাল থেকে মানুষ পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করছে। পরিবেশের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে পরিবেশের পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণকর হস্তক্ষেপের কারণে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই পৃথিবীই মানুষের অকল্যাণকর হস্তক্ষেপের কারণে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জন্য দুঃখ দুর্দশা ও দুর্ভোগ বয়ে আনে। আমরা একটু সচেতনতা অবলম্বন করলেই এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নিম্নে পরিবেশ দূষণের প্রতিকার উল্লেখ করা হলো :

১. কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জলবিদ্যুৎ, বায়ুকল, সৌরশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২. স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার করতে হবে। জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনাকে জৈবিক সারে রূপান্তর করতে হবে।

৩. স্থায়ী/অক্ষয়ী রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার যা খাদ্য-শিকলে প্রবেশ করে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated pest mangement, IPM) অনুসরণ করতে হবে।

৪. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা গড়ে তোলতে হবে।

৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই উপজাত তৈরির নীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে একদিকে দূষণ বিমুক্ত হবে, অপর দিকে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

৬. বীজ, সার, পানি ব্যবস্থাপনা, আপদব্যবস্থাপনা, চাষাবাদ প্রণালী ইত্যাদি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যেন মৃত্তিকা দূষণ নূন্যতম পর্যায়ে রাখা যায়।

৭. রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে প্রাকৃতিক পদার্থের (যেমনঃ জৈবসার, সবুজ সার, কম্পোস্ট, খামারজাত সার, জীবাণু সার ইত্যাদি) ব্যবহার বাড়ানো আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অসুবিধা হলেও দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা বিবেচনা করে ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৮. মাটি, বায়ূ এবং পানির গুণগত মান রক্ষা জাতীয় পরিবেশ নীতির একটি মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। উৎপাদনশীল কৃষি জমির অপব্যবহার এবং অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খলাযুক্ত নগরায়ণের হ্রাস করতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৯. পরিবেশবান্ধব পণ্যগুলি তাদের ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য সস্তা করা উচিত, এবং এই পণ্যগুলি দেশব্যাপী ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা সম্পর্কে লোকদের জানা উচিত।

১০. দূষণ রোধের জন্য পর্যাপ্ত সবুজ অঞ্চল ও পার্ক গড়ে তুলতে হবে, পৌরসভাকে একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।

১১. শব্দ দূষণ প্রতিরোধের জন্য উন্মুক্ত বাজার, বিনোদন ও বিনোদন সুবিধা, শহরের অভ্যন্তরে স্কুল এবং পার্কগুলি গাছ এবং অন্যান্য গাছপালা দ্বারা ঘিরে থাকতে হবে। শিল্প অঞ্চল এবং উদ্ভিদগুলিও সবুজ অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত হওয়া উচিত।

১২. প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটসহ গণমাধ্যমই পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের মূল উৎস। তাই ইতিবাচক পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা উচিত।

১৩. পরিবেশ যেমন দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাগুলি সমাধানে মানুষকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমগুলিতে পরিবেশগত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১৪. পরিশেষে, পরিবেশগত সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য, সমস্যার প্রতি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষয়িষ্ণু কৃষি পরিবেশ (Degraded agricultural environment)

মানুষ তার মৌলিক চাহিদা ও অন্যান্য কল্যাণে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করছে। কিন্তু একাজে মানুষ যখন যৌক্তিক সীমা লঙ্ঘন করে তখনই পরিবেশ দূষিত হয়, বিপদ সঙ্কুল হয়, সৃষ্টি হয় পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। এটাই পরিবেশের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। যেমন- উন্নত জাতের ধানের আবাদ। ফলে বেড়েছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও সেচ পানির ব্যবহার। কমেছে জৈব সার ব্যবহার আর সেচের পানির উৎস। এতে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়েছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার প্রকোপ ক্রমে বাড়ছে।

কৃষি পরিবেশে ক্ষতিকর/বিরূপ প্রভাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. অবিরত একই জমিতে একক ফসল (ধান) চাষ করা হচ্ছে। এর ফলে জমিতে জৈব পদার্থ দ্রুত কমে যাচ্ছে, মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের অভাব দেখা দিচ্ছে।

২. রবি মৌসুমে গম বা বোরো ধান চাষ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজ ফসল আবাদ কমে গিয়েছে। ফলে মাটির জৈব পদার্থ ও উপকারী অণুজীবের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

৩. পাটের বাজার মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম থাকায় পাটের চাষ কমেছে। ফলে জৈব জ্বালানীর অভাবে গোবর, ঘাস, পাতা ইত্যাদির জ্বালানী রূপে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. বিভিন্ন ফসলে অধিক ইউরিয়া (নাইট্রোজেন) ও রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। মাটির গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটছে।

৫. ফসলে অধিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ হচ্ছে। অবশিষ্ট স্থিতি (Residue) বাড়ছে । মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে।

৬. নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বন উজাড় হচ্ছে। এর ফলে ভূমি ক্ষয় বেড়েছে। জীব পরিবেশ ভারসাম্যতা হারিয়েছে।

৭. দেশের সকল পৌর এলাকার বর্জ্য এবং শিল্প কারখানা, ইটের ভাটা, ধানের মিল প্রভৃতির নানাবিধ বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে। এসবের ফলে মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। জলাশয়, নদী, খাল ও বিলের মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

৮. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলবর্তী স্থানে বাণিজ্যিক বাগদা চিংড়ির চাষ বাড়ছে। ফলে কৃষি পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। যেমন- জমিতে ক্রমাগত লোনা পানি ঢুকানোর ফলে মাটিতে লবণাক্ততা বাড়ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষি পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ দূষণ মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন। শিল্পকারখানার অপরিশোধিত আবর্জনা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এসিড বৃষ্টি, রাসায়নিক সার, দারিদ্রতা পরিবেশকে দূষিত করছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানব দেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। বায়ুমন্ডলে জ্বালানি এর আধিক্যের কারনে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। পরিবেশ দূষণ রোধে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমাতে হবে। মানুষ তার মৌলিক চাহিদা ও অন্যান্য কল্যাণে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করছে। চাহিদা ও অন্যান্য কল্যাণে পরিবেশের বিভিন্ন লঙ্ঘন করে তখনই পরিবেশ দূষিত হয়, সৃষ্টি হয় পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। যেমন- উন্নত জাতের ধানের আবাদ। ফলে বেড়েছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। বায়ু দুষণের প্রধান উৎস কী ?
ক) এমোনিয়া খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড
গ) সায়ানাইড ঘ) ফেনল

২। কোনটির দক্ষ্য ব্যবহার মৃত্তিকা দূষণ হ্রাস করবে ?
ক) রাসায়নিক সার খ) কার্বন- মনো-অক্সাইড
গ) জৈব সার ঘ) কয়লা

৩। অবিরত একই জমিতে কোন ফসল চাষের ফলে জৈব পদার্থ কমে যাচ্ছে ?
ক) পাট খ) ধান
গ) ডাল ঘ) গম

পাঠ-৪.৪ কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষকের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষকের অবদান বলতে ও লিখতে পারবেন।

কৃষকরা আমাদের পরিবেশ রক্ষায় এবং মাটিতে কার্বন আবদ্ধ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এটি দেখতে থাকি বা না দেখি, কৃষকরা বিশ্বকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে কঠোর পরিশ্রম করে, তবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষাও দেয়।

কৃষকদের জমির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক আদি কৃষক যেখানে বেড়ে ওঠেছে সেই জমিতে বাস করছেন এবং কাজ করছেন, এবং এটি প্রজন্ম ধরে চলে গেছে। একটি খামারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হ'ল তার মাটি। স্বাস্থ্যকর মাটি জটিল, তবে কৃষকরা প্রতিদিন মাটির শারীরিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বেশি শিখছেন যা মাটিকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে।

কৃষকরা পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে এমন অনেকগুলি সংরক্ষণ অনুশীলনে জড়িত। সংরক্ষণ বলতে কম সম্পদ (resources) ব্যবহার করা এবং জমিতে কম প্রভাব ফেলতে বোঝায়। কৃষকরা তাদের খামারগুলিতে যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে-

- শূন্য কর্ষণ (Zero-tillage),
- আচ্ছাদন ফসল বপন (Planting cover crop),
- শস্য পর্যায় (Crop rotation) এবং
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM) প্রয়োগ।

শূন্য কর্ষণ (Zero-tillage)

কোন খামারে শূন্য কর্ষণ বলতে এমন একটি অনুশীলনকে বোঝায় যেখানে কৃষকরা জমির মাটি আলোড়িত করে বীজ বপন/রোপন করার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। ফলে ফসলের অবশিষ্ঠাংশ মাটিতে রয়ে যায়। ফলে মাটি বাতাসে উড়ে যায় না এবং পানিতেও ধুয়ে যায় না। এই পদ্ধতিতে কৃষকরা মাটিকে আলোড়িত না করে এবং ফসলের অবশিষ্টাংশকে রেখে দিয়ে জমিকে সংরক্ষণ করে। এই পদ্ধতিতে অল্প আদ্রর্তার ক্ষেত্রেও উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন করতে পারে। এতে শ্রম, সময় এবং পানির ব্যবহার কম হয়। প্রচলিত কর্ষণ মাটির দলাকে ভেঙ্গে ফেলে এবং মাটির জৈব পদার্থের জারণ হয়; ফলে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের (যেমন: নাইট্রাস অক্সাইড এবং মিথেন) নির্গমন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শূন্য কর্ষণ বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাস করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরুপ প্রভাব হ্রাস করার সাথে সাথে মাটির ফিজিকো-রাসায়ানিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নত করে। তাছাড়া আগাছা উপদ্রব কম হয়, মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পায় এবং ভূমিক্ষয় কম হয়। ফলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

আচ্ছাদন ফসল বপন (Planting cover crops)

আচ্ছাদন ফসল (যেমন: রাই, ওট, গম, ক্লভার, আলফাআলফা, বরবটি ইত্যাদি) এমন একটি ফসল যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শীতকালে বা অফ-সিজনে ফসলি জমিতে রোপণ করা হয়। কৃষকরা মাটি ক্ষয়রোধে সহায়তা করার জন্য এই ফসল রোপন করেন। আচ্ছাদিত ফসলগুলি মাটি ক্ষয় রোধে সহায়তা করে কারণ এই গাছগুলি মাটিকে তাদের শিকড়ের সাহায্যে ধরে রাখে যার ফলে বাতাস বা পানিতে মাটি ধুয়ে যেতে পারে না। আচ্ছাদিত ফসল মাটিতে জৈব পদার্থ এবং কার্বন বাড়ায়; বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন যোগ করে এবং কৃষক কতৃক প্রয়োগকৃত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের প্রয়োজনয়ীতা হ্রাস করে। ফলশ্রুতিতে মাটির উর্বরতা এবং গুনগতমান উন্নত করতে সহায়তা করে। পশুর খাদ্যের উৎস হিসাবে বসন্তকালে আচ্ছাদন ফসল কাটা যেতে পারে, বা সেগুলি সবুজ সার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া যায়। আচ্ছাদন ফসল আগাছা ঘনত্ব এবং আকার হ্রাস করে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে, এবং রাসায়নিক ইনপুটগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে প্রয়োজনীয় হার্বিসাইডের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। আচ্ছাদন ফসল মাটির আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

করে, পলিনেটরদের আকৃষ্ট করে। রোগ ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীববৈচিত্র্য তরান্বিত করে। গ্রীণহাউজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাস করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব হ্রাস করতে সহায়তা করে।

শস্য পর্যায় (Crop rotation)

শস্য পর্যায় বলতে একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে বোঝায়। যখন বছর বছর শস্য পর্যায় করা হয় তখন পোকামাকড় তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে না যা কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে পারে। লিগুমজাতীয় ফসল (যেমন- শিম, ধৈঞ্চা) মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, যা পরবতী ফসলে নাইট্রোজেন যোগান দেয়। এতে কৃষকের অর্থ সাশ্রয় হয় কারণ কৃষক তখন বেশী পরিমানে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করবে না এতে পরিবেশকেও সহায়তা করে কারণ পুষ্টি উপাদান ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এটি মাটির উৎপাদনশীল ক্ষমতা সংরক্ষণ, রোগ কমানো, রাসায়ানিক ব্যবহার হ্রাস করতে এবং পুষ্টির প্রয়োজনীতা পরিচালনা করার জন্য করা হয়, এসবগুলিই ফলন সর্বাধিকরণে (maximize) সহায়তা করে। এই পদ্ধতিটি খামারের মাটিতে কার্বন সংরক্ষনের ক্ষমতা বাড়ায়।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated pest management, IPM)

কম সম্পদ (resources) ব্যবহার করা এবং খামারে কীভাবে সম্পদ পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি করা কৃষকদের জমি রক্ষায় সহায়তা করার এক উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি জমিতে অত্যাধিক কীটনাশক প্রয়োগ করার ফলে শস্যকে সহায়তা করার পরিবর্তে পরিবেশের ক্ষতি করে বিধায় কৃষকরা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে তাদের খামারে কীটনাশক এবং ভেষজনাশক ব্যবহার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। আইপিএম এর ভিত্তি হ'ল কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গ ব্যবহার করা। আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ বালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়, যাতে করে পরিবেশ দূষিত না হয়। কীটপতঙ্গ কেবল একটি নির্দিষ্ট ধরণের উদ্ভিদ খেতে পারে, তাই যদি কোনও কৃষক একটি নতুন ধরণের উদ্ভিদ প্রবর্তন করেন তবে কীটপতঙ্গটির আর কোনও খাদ্য উৎস থাকতে পারে না। কৃষকরা তাদের ক্ষেতে পোকার প্রজাতিও প্রবর্তন করতে পারে যা কীটপতঙ্গ খায়। এই শিকারী প্রজাতিগুলি জমিতে কীটপতঙ্গগুলির সংখ্যা হ্রাস করতে সহায়তা করবে, যা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করবে। এতে পরিবেশের সামগ্রিক উপকার হয় কারণ ক্ষতিকারক কম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দুষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পূর্ণ কর্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

কৃষকরা আমাদের পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকরা তাদের খামারগুলিতে যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি হলো- শূন্য কর্ষণ, আচ্ছাদন ফসল বপন, শস্য পর্যায়, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা। শূন্য কষণে মাটিকে আলোড়িত না করে এবং ফসলের অবশিষ্ঠাংশকে রেখে দিয়ে জমিকে সংরক্ষণ করা হয়। আচ্ছাদন ফসলি মাটিকে তাদের শিকড়ের সাহায্যে ধরে রাখে ফলে বাতাস বা পানিতে মাটি ধুয়ে যেতে পারে না। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে শস্য পর্যায় বলে। শস্যপর্যায় ফলে পোকামাকড় তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে না যা কীট নাশকের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করেছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকর পোকা ও রোগ বালাই অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নীচে রাখা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। পরিবেশ রক্ষায় এবং মাটিতে কার্বন আবদ্ধ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কে সহায়তা করছে ?
ক) শিল্পপতি খ) কৃষক
গ) বিজ্ঞানী ঘ) শিক্ষক

২। কোন জাতীয় ফসল মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে ?
ক) লিগুমজাতীয় খ) ক্রুসিফেরাস জাতীয়
গ) সোলানেসী জাতীয় ঘ) গ্রামিনী জাতীয়

৩। কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষকরা কোনটি ব্যবহার করে ?
ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা খ) মাল্টিপারপাস বৃক্ষ
গ) আগাছা দমন ঘ) চুন প্রয়োগ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট এর কারনে পৃথিবীর সাথে সাথে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র আজ হুমকির মুখে। তুলিদের কলেজ শিক্ষক একদিন জীববৈচিত্র কি, এর গুরুত্ব, বনজ, মরুজ ও জলজ পরিবেশ ও তার জীববৈচিত্র সম্পর্কে ধারণা দিলেন। সাথে সাথে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে কি করা উচিত তা জানতে পারলেন।

ক) জীববৈচিত্র কি?
খ) জীববৈচিত্র এর গুরুত্ব লিখ?
গ) জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) পরিবেশ দূষণ রোধে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ?

References

Islam, S., Uddin, MT., Akteruzzaman, M., Rahman, M., and Haque, M.A., Profitability of alternate farming systems in dingapota haor area of Netrokona district. Progressive Agriculture, 22 (1 & 2): 223 – 239, 2011.

Uddin, MT. and Dhar, AR., Char people's production practices and livelihood status: An economic study in Mymensingh district. Journal of Bangladesh Agricultural University, 15(1): 73–86, 2017.